জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১

খাদ্যনিরাপত্তা ও ইসলাম : পরিপ্রেক্ষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

মুহাম্মদ ছালেহ উদ্দীন*

Abstract

Food is an essential element in the development, prevention of corrosion and meeting the nutritional needs of the human body. Food security is very important issue in Islam. Food security means self-sufficiency in food, no food shortage, no food problem, no food crisis, etc. In the current global context, the term food security is one of the Sustainable Development Goals (SDGs) declared by the United Nations. The relationship between food security and sustainable development is inextricably linked. Islam directly or indirectly agrees with these goals. Moreover, long before the announcement of this development goal, a complete outline of food security has been laid down in the Islamic way of life, which is clearly stated in the Holy Qur'an and Hadith. This article will discuss the Islamic guidelines on sustainable goals on food security announced by the United Nations to achieve sustainable food security. From an Islamic point of view, every human being has the right to food. But some disgusting people of the society are destroying the food stock, adulterated mixture, waste, etc. Food adulteration, stockpiling, black market, declining production; Above all, food security is threatened by man-made causes as well as natural causes. Islam has identified the obligation of food production. Besides, it has declared all food related offenses including food stocks and adulterated mixtures as 'Haraam'. Therefore, every person in the Islamic society and the state authorities will be able to ensure sustainable food security by following the principles and guidelines displayed by Islam.

ভূমিকা

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। মানব শরীরের বিকাশ, ক্ষয়রোধ ও পুষ্টি চাহিদা মেটানোর অত্যাবশ্যকীয় উপাদান খাদ্য। এজন্য হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টির পর, জীবনধারণের অন্যতম মৌলিক চাহিদা অপূরণীয় থাকবে না– মর্মে অভয়বাণী দিয়েছিলেন আল্লাহ রাব্বুল অলামিন। খাদ্য গ্রহণ ও বর্জনের সাথে মানুষের সম্পর্ক প্রকৃতিগত। খাদ্যনিরাপত্তার বিষয়টি তাই ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যনিরাপত্তা হলো খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া, খাদ্যঘাটতি না থাকা, খাদ্যসমস্যা না থাকা, খাদ্যসঙ্কট সৃষ্টি না হওয়া ইত্যাদি। খাদ্যনিরাপত্তা ব্যাপারটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে খাদ্যনিরাপত্তা বিষয়টি জাতিসংঘ-ঘোষিত এসডিজি তথা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলির মধ্যে অন্যতম। এ চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রার অধীনে আটটি বিশেষ লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এ লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই খাদ্যনিরাপত্তা বিধান করে টেকসই উন্নয়ন অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা সুনির্ধারিত। ইসলামি বিধিব্যবস্থা এ লক্ষ্যগুলোর সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে একমত পোষণ করে। তাছাড়া এ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণার বহুপূর্বেই ইসলামি জীবনব্যবস্থায় খাদ্যনিরাপত্তার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা নির্ধারণ করা আছে, যা পবিত্র কুরআন ও হাদিসে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত। একইসাথে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় আলোচিত হয়নি

*সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

এমন কয়েকটি স্বতন্ত্র উপায়েও ইসলাম টেকসই খাদ্যনিরাপত্তা বিধানের নির্দেশনা দিয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে টেকসই খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই খাদ্যনিরাপত্তা লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিষয়ে ইসলামি নির্দেশনা আলোচনা করা হবে। এ প্রবন্ধে মৌলিক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research) অনুসরণ করা হয়েছে। গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসেবে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis Method) প্রয়োগ করা হয়েছে এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে ইসলামি নির্শেনার তুলনামূলক পর্যালোচনায় ব্যাখ্যামূলক গবেষণা (Explanatory Research) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধে চিহ্নিত নির্দেশনার আলোকে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হলে টেকসই খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

খাদ্যনিরাপত্তা পরিচিতি

সাধারণত খাদ্যনিরাপত্তা বলতে খাদ্যের লভ্যতা এবং মানুষের খাদ্য ব্যবহারের অধিকারকে বোঝায়। খাদ্যনিরাপত্তা এমন একটি ব্যাপকতর বিষয় যাকে এক কথায় সংজ্ঞায়ন করা যায় না। ১৯৭০ এর দশকে খাদ্যনিরাপত্তা ধারণাটি বিকশিত হওয়ার পর থেকে এর সংজ্ঞায়নে বিভিন্ন গবেষক ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। ১৯৯৬ সালে World Health Organization (WHO) কর্তৃক আয়োজিত World Food Summit (WFS)-1996 এ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনে খাদ্যনিরাপত্তার একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এ সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- 'ব্যক্তিগত, পারিবারিক, জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে সব মানুষ তাদের সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবন ধারণের জন্য পরিমাণে পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও সঠিক পুষ্টিমানের খাদ্য যোগান বা সরবরাহের নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করাকে খাদ্যনিরাপত্তা বলে।'[১] এ সংজ্ঞাটি পুনরায় The State of Food Insecurity 2001- এ খাদ্যনিরাপত্তার সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, ফলে এটি খাদ্যনিরাপত্তার একটি সর্বজনীন সংজ্ঞায় পরিণত হয়েছে। সর্বোপরি, খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রথমত, একটি পরিবার ও গোটা জাতির প্রয়োজনীয় মোট খাদ্যের প্রাপ্যতা। দ্বিতীয়ত, স্থানভেদে বা ঋতুভেদে খাদ্য সরবরাহের যুক্তিসঙ্গত স্থায়িত্ব। তৃতীয়ত, নির্বিঘ্ন ও মানসম্মত পরিমাণ খাদ্যে প্রত্যেক পরিবারের ভৌত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবাধ অধিকারের নিশ্চয়তা।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে খাদ্যনিরাপত্তা ও ইসলাম

উন্নয়নের বহুমাত্রিক ধারণা, তত্ত্ব ও কর্মপরিকল্পনা থাকলেও আধুনিক সময়ে টেকসই উন্নয়ন ধারণাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর হিসেবে প্রমাণিত। জাতিসংঘ ২০১৫ সালের ২৫ই সেপ্টেম্বর ১৫ বছর মেয়াদি (২০১৬-২০৩০) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) নির্ধারণ করেছে। টেকসই উন্নয়ন বলতে উন্নয়নের সাথে মানবসমাজ ও পরিবেশের সুসম্পর্ক তৈরীপূর্বক উন্নয়নের সুফল দীর্ঘমেয়াদি করা বুঝায়। টেকসই উন্নয়নের ১৭টি প্রধানতম লক্ষ্যমাত্রার ২য় লক্ষ্যমাত্রা হলো- ক্ষুধা মুক্তি- ক্ষুধার অবসান, খাদ্যনিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার অর্থাৎ, টেকসই খাদ্যনিরাপত্তা। এ চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রার অধীন ৫টি বিশেষ লক্ষ্য নির্ধারিত। নিম্নে এ লক্ষ্যগুলো অর্জনে ইসলামি নির্দেশনা তুলে ধরে জনসচেতনতা তৈরি ও আমাদের করণীয় নির্ধারণ করার প্রয়াস রইল।

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-১

"২০৩০ সালের মধ্যে সকল মানুষ, বিশেষ করে অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী, দরিদ্র জনগণ ও শিশুদের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারসহ বছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ক্ষুধার অবসান ঘটানো।"[২] এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয়াদি হলো–

১. নিরাপদ খাদ্য : নিরাপদ খাদ্য বলতে এমন খাদ্য বুঝায় যা মানুষের স্বাভাবিক ব্যবহারে শারীরিক পুষ্টিসাধন করে এবং কোনো ধরনের ক্ষতিকর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ অনুসারে- "নিরাপদ খাদ্য" অর্থ- প্রত্যাশিত ব্যবহার ও উপযোগিতা অনুযায়ী মানুষের জন্য বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত আহার্য।"[৩] খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহণ, খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ার যেকোনো পর্যায়ে খাদ্য ভোগের অনুপযোগী হয়ে যেতে পারে। খাদ্যে ভেজাল বলতে খাদ্যে নিম্নমানের, ক্ষতিকর, অকেজো ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মেশানো বুঝায়। প্রকৃতিগত ও গুণগত নির্ধারিত মানসম্মত না হলে যেকোনো খাদ্যদ্রব্যই ভেজালযুক্ত বিবেচিত হতে পারে। এছাড়া খাদ্যশস্যে বহির্জাত পদার্থ সরাসরি যোগ করার মাধ্যমেও ভেজাল দেয়া হয়- যেমন ওজন বৃদ্ধির জন্য বালি বা কাঁকর, ভাল শস্যের সঙ্গে কীটপতঙ্গ আক্রান্ত বা বিনষ্ট শস্য মেশানো ইত্যাদি। ইসলাম মালের দোষ গোপন করা, ধোঁকা দেওয়া, পণ্যের মান নিয়ে প্রতারণা করা ও ভালো পণ্যের সাথে মন্দ পণ্য মিশ্রণ করাসহ যেকোনো ধরনের ভেজাল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মহানবী (সা.) বলেছেন- "সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদের উপর অস্ত্র তোলে। আর যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সেও আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৪]

২. পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি ও অভাবীদের খাদ্য খাওয়ানো : টেকসই খাদ্যনিরাপত্তার একটি অন্যতম দিক হলো সকল মানুষ তথা শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধীসহ সকলের পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে ক্ষুধা মুক্তি। ইসলাম সকলের খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানে গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলামে জরুরিয়াত বা মৌলিক প্রয়োজনীয় ৫টি বিষয়ের অন্যতম হচ্ছে- নফসের (জীবনের) নিরাপত্তা। জীবনের নিরাপত্তার সাথে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, পরিবহন, পরিবেশ, বিশ্রাম, অবসর, বিশুদ্ধ পানীয়, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া, শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা ইত্যাদি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই খাদ্য সংগ্রহে অসমর্থ ব্যক্তিকে খাদ্য খাওয়ানো সামর্থ্যবানদের কর্তব্য। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী- এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন? ইসলামের মধ্যে সর্বোত্তম কাজ কোনটি? তিনি বললেন, অপরকে খাদ্য খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলের মাঝে সালামের প্রচলন করা।"[৫]

৪. অরক্ষিত পরিস্থিতিতে খাদ্যনিরাপত্তা : টেকসই খাদ্যনিরাপত্তার লক্ষ্যে অরক্ষিত পরিস্থিতিতে তথা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদিতে জনসাধারণের খাদ্যনিরাপত্তা বিধান করতে হবে। ইসলামি দৃষ্টিকোণে দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রে সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য ইসলামি রাষ্ট্রের যিনি কর্ণধার হবেন তাঁর। কেননা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকার জনসাধারণের সকল দুঃখ-কষ্ট নিবারণের সম্ভাব্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালানো তার জন্য ফরজ। হযরত ওমর (রা.) দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষপীড়িত মদীনার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে সমস্ত গর্ভনর ও প্রশাসকদের নিকট পত্র পাঠান। এছাড়াও দুর্যোগকালীন খাদ্যনিরাপত্তার লক্ষ্যে গুদাম নির্মাণ করেন।[৬]

৫. দুগ্ধপোষ্য শিশু ও বিধবাদের জন্য ভাতা : ইসলাম খাদ্যনিরাপত্তা বিধানে দুগ্ধপোষ্য শিশু ও বিধবাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেছে। হযরত ওমর (রা.) এর খিলাফতকালে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য দশ দিরহাম হারে ভাতা নির্দিষ্ট ছিল। হাদিসেও শিশু, বিধবা, অসহায় ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের লালন-পালনসহ সার্বিক ভরণপোষণের দায়িত্ব ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে, রাষ্ট্রপ্রধান বায়তুল মাল থেকে তাদের খাবার, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করবে। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আমি মুমিনদের পক্ষে তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। কেউ সম্পদ রেখে গেলে তা তার পরিজনের জন্য। কেউ ঋণ অথবা পোষ্য (অসহায় শিশু অথবা বিধবা স্ত্রী) রেখে গেলে তার দায়দায়িত্ব আমার উপর।'[৭]

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-২

"২০২৫ সালের মধ্যে অনূর্ধ্ব ৫-বছর বয়সী খর্বকায় ও রুদ্ধবিকাশ শিশু বিষয়ক আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত সকল অভীষ্ট অর্জন এবং কিশোরী, গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী নারী ও বয়স্ক জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণসহ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল ধরনের অপুষ্টির অবসান।"[৮] এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয়াদি হলো–

১. অপুষ্টির অবসান : মানুষের জীবনধারণের জন্য শক্তির প্রয়োজন, আর শক্তির উৎস হলো পুষ্টিকর খাদ্য। পুষ্টিকর খাদ্য ব্যতীত মানবদেহের বিকাশ ব্যাহত হয়, কর্মস্পৃহা-কর্মক্ষমতা হারায়, রোগাক্রান্ত হয়। খাদ্যনিরাপত্তা বিধানে পর্যাপ্ত খাদ্য লভ্যতার পাশাপাশি খাদ্যের পুষ্টির নিশ্চয়তা তথা অপুষ্টির অবসান করা জরুরি। পুষ্টিবিজ্ঞানীরা খাদ্যের পুষ্টি উপাদানকে ৬টি ভাগে ভাগ করেছেন- ১. আমিষ, ২. শর্করা, ৩. স্নেহ বা চর্বি, ৪. ভিটামিন, ৫. খনিজ লবণ বা অজৈব পদার্থ, ৬. পানি।[৯] আল কুরআন ও হাদিসে এ সকল পুষ্টিজাত খাদ্যের গুণাগুণ বর্ণনা করে মানব দেহের জন্য প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করেছে। আল কুরআন ও হাদিসে গম (فوم), রুটি (خبز), মধু, কালোজিরা, জয়তুন তেল (وزيتونا), সরিষা (خردل), চর্বি (شحم), ঘি (سمن), প্রাণিজ আমিষ হিসেবে মাছ (سمك) ও গোসত (لحم), দুধ (لبن), ডিম (البيض), ডাল (حب), বিভিন্ন ফল (ثمرة), সবজি-লাউ (دباء) ইত্যাদি উল্লেখ রয়েছে। পুষ্টিকর খাবারের মধ্যে অন্যতম মধু সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

وَ اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ۔ ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۔

"তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে তার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন, গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। এরপর প্রত্যেক ফল থেকে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর। এর উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য। অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।"[১০]

পুষ্টিকর খাদ্যের অন্যতম হলো প্রাণীজ আমিষ। পশুর গোশত সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

وَ الْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّ مَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۔

"তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য এতে শীত নিবারণ উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে। এবং তা হতে তোমরা আহার করে থাক।"[১১]

২. স্তন্যদায়ী নারী ও শিশুর অপুষ্টি দূর : ইসলাম স্তন্যদায়ী নারী ও শিশুর অপুষ্টি সমস্যা সমাধানে নির্দেশনা দিয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ ۔

"যে স্তন্যকাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর স্তন্য পান করাবে, পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা।"[১২]

এ আয়াতের আলোকে মাতার উপর অত্যাবশ্যক হলো- সন্তানকে দুধ পান করানো একই সাথে পিতার উপর দায়িত্ব হলো স্তন্যদায়ী মাকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাছীর বলেন, "শিশুদের জননীগণের ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব তাদের জনকদের উপর রয়েছে।"[১৩]

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৩

"২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মাছচাষীদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা এবং এ লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরিক্ষত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করাসহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ।"[১৪] এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয়াদি হলো–

১. ক্ষুদ্র পরিসরে কৃষি উৎপাদন : টেকসই খাদ্যনিরাপত্তা বিধানে প্রচলিত কৃষি কাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উন্নয়নেও মনোনিবেশ করতে হবে। ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদন বলতে পারিবারিক কৃষি, পশুপালন, পারিবারিক ও ব্যক্তি উদ্যোগে মৎস্য চাষ, মৎস্য শিকার ইত্যাদি। ইসলামও এ ধরনের ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করে। জলে ও স্থলের মাছ অথবা পশু শিকার সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۔

"তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও এর ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে। তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য। তোমরা যতক্ষণ ইহরামে থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম।"[১৫]

২. প্রান্তিক কৃষকের আয় বৃদ্ধি : খাদ্যনিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে প্রান্তিক কৃষকের আয় বৃদ্ধির বিকল্প নেই। কেননা খাদ্য শস্যের এক বিরাট অংশ এ সকল প্রান্তিক কৃষকের মাধ্যমেই আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে প্রান্তিক কৃষকরা ফসলের সঠিক মূল্য পায় না। তাই প্রান্তিক কৃষককে মধ্যস্বত্বভোগীদের কবল থেকে রক্ষার জন্য এবং টেকসই খাদ্যনিরাপত্তার জন্য যত দ্রুত সম্ভব কৃষির সমবায়ীকরণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে তিন ধরনের সমবায় গড়ে তোলা যেতে পারে- (ক) উৎপাদন সমবায়; (খ) সরবরাহ সমবায় এবং (গ) বিপণন সমবায়। এছাড়াও আমূল ভূমি

সংস্কার প্রবর্তন করে মালিকানা ব্যবস্থায় ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমস্ত খাস জমি, জলাশয়, নদ-নদী এমনকি সাগর উৎপাদন সমবায়ের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। সববায় ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সম্ভব হলে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে। ইসলাম উৎপাদন ও বিপণনসহ সকল ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করেছে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "(দালালী করার উদ্দেশ্যে) দাম বাড়িয়ে বলবে না, কোনো ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয় বিক্রয়ের উপর ক্রয় বিক্রয় না করে, শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রয় না করে।"[১৬]

৩. প্রান্তিক কৃষকের জন্য ভূমি ও উৎপাদনশীল সম্পদে সমান সুযোগ : ভূমি ও উৎপাদনশীল সম্পদে কৃষকের সুষম সুযোগ খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থাপনায় জমিদার শ্রেণিই ভূমি ও উৎপাদনশীল সম্পদে প্রভাব বিস্তার করে, ফলে কৃষি কাজে কৃষকের অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়। এভাবে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায়। ইসলামি দৃষ্টিকোণে মানুষ ভূমির নিরংকুশ মালিক নয়; বরং প্রকৃত ও নিরংকুশ মালিক হচ্ছেন মহান আল্লাহ। তবে মানুষের বসবাসের জন্য ও চাষাবাদের মাধ্যমে ভূমি থেকে উৎপন্ন শস্য ভোগ করার অধিকার দেয়া হয়েছে মানুষকে। মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ

"জমিনতো আল্লাহর, তিনি তার বান্দাদের মধ্য যাকে ইচ্ছে এর উত্তরাধিকারী করেন।"[১৭]

৪. প্রান্তিক কৃষকের মাঝে কৃষি উপকরণ, কৃষি তথ্য ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান : খাদ্যনিরাপত্তায় যথাযথ উৎপাদনশীল কৃষি উপকরণ, কৃষি তথ্য তথা কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কৃষি কাজে আর্থিক সহযোগিতার গুরুত্ব অনেক। সুতরাং ইসলামি রাষ্ট্রকে প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ দেয়ার পাশাপাশি কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহযোগিতা দিতে হবে। কেননা আধুনিক যুগে কৃষি উন্নয়নের যতবিধ উপায়-উপকরণ ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হয়েছে, সে সবের সাহায্যে কৃষির উন্নতি বিধান করা এবং আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি কৃষকের ব্যবহারের জন্য তার দরজা পর্যন্ত সহজভাবে ও সহজ শর্তে পৌঁছে দেয়া ইসলামি রাষ্ট্রের (হুকুমাতের) জন্য বাধ্যতামূলক।[১৮]

৫. প্রান্তিক কৃষকের কৃষিপণ্য বিপণন ও মূল্য সংযোজনের সুযোগ : প্রান্তিক কৃষকের বিপণন ও মূল্য সংযোজনে সমান সুযোগ থাকতে হবে। ফলে কৃষক যেমন ন্যায্য মূল্য পাবে তেমনি ভোক্তারাও ন্যায্য মূল্যে খাদ্যদ্রব্য ভোগ করার সুযোগ পাবে। সুতরাং খাদ্যনিরাপত্তার লক্ষ্যে মজুতদারী, ফটকাবাজি, কালোবাজারি, মুনাফাখোরী বন্ধ করতে হবে। এ সকল অনৈতিকতা বন্ধ হলে কৃষক ও ভোক্তা স্বাধীনভাবে দরকষাকষির মাধ্যমে পণ্য ক্রয়ের সুযোগ পাবে। ইসলাম এ ধরনের অনৈতিকতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। একইভাবে ইসলাম কালোবাজারি, মুনাফাখোরী, মজুদদারী সবই নিষিদ্ধ করেছে। মজুতদারি ও সম্পদ জমা করে রাখা ইসলামে নিষিদ্ধ। মহানবী (সা.) বলেছেন, "অপরাধী ব্যতীত কেউই গুদামজাত করে রাখে না।"[১৯]

৬. প্রান্তিক কৃষকদের কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে সুযোগ লাভ : প্রান্তিক কৃষক তথা বিশেষ সময়ে সুবিধা অনুযায়ী ক্ষুদ্র কৃষিকে শ্রম বিনিয়োগকারী কৃষকদের কৃষি অনুপোযোগী সময়ে অন্য কাজে শ্রম বিনিয়োগের সুযোগ থাকা খাদ্যনিরাপত্তায় সহায়ক। কেননা শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা বাড়াতে হলে তাদেরকে পেশা গ্রহণের স্বাধীনতা দিতে হবে। ফলে প্রান্তিক কৃষকরা কৃষি মৌসুমে কৃষি কাজের পাশাপাশি কৃষি অনুপোযোগী সময়ে অন্য কাজ করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে।

ইসলামি সমাজের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য এই যে, এ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি তার পছন্দ মতো পেশা গ্রহণের অবাধ স্বাধীনতা পায়। মহান আল্লাহ সালাত শেষ হলে জীবিকার অন্বেষণে বেরিয়ে যেতে বলেছেন, সুতরাং যে কেউ তার পছন্দ মতো পেশা গ্রহণের সুযোগ পাবে। কুরআনের বাণী,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ـ

"সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে।"[২০]

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৪

"২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং অভিঘাতসহনশীল এমন একটি কৃষিনীতি বাস্তবায়ন করা যা উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে, বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের সহায়ক, জলবায়ু পরিবর্তন, চরম আবহাওয়া, খরা, বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগে অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ভূমি ও মৃত্তিকার গুণগতমানের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাধন করে।"[২১] এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয়াদি হলো–

১. টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা : টেকসই খাদ্যনিরাপত্তার অন্যতম দিক হলো টেকসই খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা। ইসলাম খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করে। কৃষিকাজ, বৃক্ষরোপণ, পশুপালন, শিকার, সমুদ্র থেকে আহরণ ইত্যাদি সকল ধরনের খাদ্য উৎপাদনে ইসলাম নির্দেশনা দিয়েছে। তাই ইসলামি নির্দেশনা অনুসারে টেকসই খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরার লক্ষ্যে ইসলাম নির্দেশিত পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করতে হবে। কখনো খাদ্য উৎপাদনে অনীহা করা যাবে না বা কৃষি জমি পতিত রাখা যাবে না। ইসলামি ভূমিনীতির মূলকথা হলো, জমি অনাবাদী রাখা যাবে না। কেউ যদি এমন থাকে যে, সে তার নিজের মালিকানাধীন জমি চাষ করতে পারে না, তাহলে তার জন্য অন্যকে দিয়ে জমি চাষ করানো অবৈধ হবে না। যুহাইর (রা.) বললেন, "রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তোমাদের ক্ষেত-খামার কিভাবে চাষাবাদ কর? আমি বললাম, আমরা নদীর তীরের ফসলের শর্তে অথবা খেজুর ও যবের নির্দিষ্ট কয়েক ওয়াসাক প্রদানের শর্তে জমি ইজারা দিয়ে থাকি। রাসুল (সা.) বললেন, তোমরা এরূপ করবে না। তোমরা নিজেরা তা চাষ করবে অথবা অন্য কাউকে দিয়ে চাষ করাবে অথবা তা ফেলে রাখবে।"[২২]

কিন্তু ইসলামে জমি পতিত রাখার কোনো সুযোগ নেই, কেননা দীর্ঘদিন পতিত রাখার মাধ্যমে মূলত সে তার জমিরই মালিকানা হারাবে। কেননা ইসলামি ভূমিনীতির আলোকে দীর্ঘদিন জমি চাষাবাদ না করলে তার জমির মালিকানা থাকবে না। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি জমির সীমানা নির্ধারণ করে রেখেছে, কিন্তু চাষ করেনি, তিন বছর পর তাতে তার কোনো অধিকার থাকবে না।"[২৩]

২. উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক কৃষিনীতি বাস্তবায়ন : টেকসই কৃষিনীতি তথা উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক কৃষিনীতি বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে টেকসই খাদ্যনিরাপত্তা বাস্তবায়ন সম্ভব। কৃষিকার্য ও ভূমি উন্নয়নের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা এবং উন্নত প্রণালিতে এই কাজ সম্পাদন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হলো টেকসই কৃষিনীতির অন্যতম উপাদান। ইসলাম টেকসই কৃষিনীতি বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা দেয়। যেমন-

জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা, কৃষি কাজে পানির সংস্থান ও প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন ফসলের মাঠ থেকে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত খালা-বিল খনন ও পানির পাম্প স্থাপন করা খুবই জরুরি। এ সম্পর্কে ইসলামি নীতি হলো- পুকুর, ঝিল, কূপ ও ঝরণা যদি ব্যক্তিমালিকানাধীন না হয়, তবে এসব থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "সকল মুসলমান তিনটি জিনিসের ক্ষেত্রে সম অংশীদার : পানি, ঘাস ও আগুন।"[২৪] সেচকার্যের জন্য প্রয়োজনে অধিক পরিমাণে খাল খনন করতে হবে। আর এ সকল ব্যয় বায়তুল মাল তথা সরকারি কোষাগার বহন করবে। বায়তুল মাল সম্পূর্ণ বহন করতে না পারলে সরকার এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য বিত্তবানদের বাধ্য করবে।[২৫]

৩. বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের সহায়ক কৃষিনীতি বাস্তবায়ন : টেকসই খাদ্যনিরাপত্তায় এমন কৃষিনীতি বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে করে কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ সম্ভব হয়। কেননা কৃষি উন্নয়ন ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ মানে কৃষি উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির সাথে সাথে পরিবেশের অন্যান্য উপাদানসমূহের যথাযথ অবস্থানে থাকা নিশ্চিত করা। কৃষিনীতি বাস্তবায়নের সাথে গাছ-পালা, নদী-নালা, পুকুর, উদ্ভিদ, জলচর, স্থলচর ও উভয়চর প্রাণী ও মানবদেহ ইত্যাদি জড়িত। কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক, কৃষিজমি তৈরিতে পাহাড় কাটা, অপরিকল্পিত পানি উত্তোলন, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কৃষিনীতির উপাদান হলেও এগুলো পরিমিত ও পরিকল্পিত উপায়ে না হলে তা আমাদের পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। ইসলামি দৃষ্টিকোণে কারো উন্নয়নের মাধ্যমে কারো ক্ষতি করার সুযোগ নেই, অর্থাৎ উন্নয়নের নামে পানি, বায়ু ও মাটি দূষণ করা বা উদ্ভিদ ও জীবের ক্ষতি ডেকে আনা যাবে না। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "টেকসই উন্নয়নকে এমনভাবে সীমিত করতে হবে, যাতে এই পৃথিবী নামের গ্রহটির প্রাণ অর্থাৎ প্রাকৃতিক ব্যবস্থা যেমন- আবহাওয়া, পানি, মাটি এবং জীবিত প্রাণী এগুলোকে (উন্নয়ন কৌশলকে) সহায়তা প্রদান করে।"[২৬] ইসলাম এমন সকল কাজকেই নিষিদ্ধ করে, যা অন্যের ক্ষতির কারণ হয়। এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং কারো ক্ষতির কারণও হওয়া যাবে না।"[২৭]

৪. কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি : জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ খাদ্যনিরাপত্তার অন্তরায়। টেকসই খাদ্যনিরাপত্তার লক্ষ্যে এমন কৃষিনীতি ও কৃষিবান্ধব কৌশল গ্রহণ করতে হবে, যা জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ অভিযোজনের সক্ষমতা তথা দুর্যোগ উপেক্ষা করে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে। যেমন- বর্ষা মৌসুমের উপযোগী ধান, একই সাথে শুষ্ক মৌসুমে কম পানি ব্যবহারে উৎপন্ন ধানের জাত আবিষ্কার, বর্ষায় ভাসমান সবজি চাষ ইত্যাদি। ইসলামও প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে বিশেষ প্রস্তুতি নিতে নির্দেশনা দেয়। ইসলামও আমাদেরকে দুর্যোগকালীন মুহূর্তে দুর্যোগ প্রশমন ও সম্পদ ব্যবহারে সক্ষমতা অর্জনে একে অন্যের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে নির্দেশনা দেয়। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের পার্থিব কষ্টসমূহের মধ্যে একটা কষ্ট দূর করে দেয়, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটা কষ্ট দূর করে দিবেন।"[২৮]

৫. ভূমি ও মৃত্তিকার গুণগতমান বৃদ্ধির সহায়ক কৃষিনীতি : টেকসই খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনে ভূমি ও মৃত্তিকার গুণগত মান বৃদ্ধির বিকল্প নেই। খাদ্য উৎপাদনের মূল উপাদান হলো ভূমি, তাই ভূমির

গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন করা সম্ভব। তাই এমন কৃষিনীতি বাস্তবায়ন করতে হবে, যা পানি ও ভূমি দূষণ দূর করে ভূমির গুণগত মান রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। কেননা ভূমি দূষণ ভূমি ও মৃত্তিকার উৎপাদনশীলতা হ্রাস করে। ইসলাম পানি ও ভূমিকে দূষণ থেকে বিরত রাখতে নির্দেশ প্রদান করেছে। ইসলামি দৃষ্টিকোণে পানি দূষিত করা মারাত্মক অমার্জনীয় অপরাধ। আল্লাহর রাসুল পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। পানির উৎস মুখে ময়লা-আবর্জনা ফেলা, পানির অপচয় করা, অপবিত্র শরীর নিয়ে বদ্ধ পানিতে গোসল করা ইত্যাদি ইসলামে নিষিদ্ধ কাজ। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে মূত্রত্যাগ না করে, যা প্রবাহিত হয় না।"[২৯]

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৫

"২০২০ সালের মধ্যে বীজ, আবাদযোগ্য শস্য প্রজাতি এবং খামারে ও গৃহে পালনযোগ্য গবাদিপশু ও এদের সমগোত্রীয় বন্যপ্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা যার অন্যতম উপায় হবে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত বহুমুখী বীজ ও উদ্ভিদ ব্যাংকের ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক ঐক্যমত্য অনুসারে, কৌলিক (জেনেটিক) সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধার সুষ্ঠু ও সমান অংশীদারিত্বের পথ সুগম করা।"[৩০] এ বিশেষ লক্ষ্যমাত্রায় চিহ্নিত বিষয়াদি হলো–

১. বহুমুখী বীজ উৎপাদন, গবাদিপশু ও সমগোত্রীয় বন্যপ্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা : বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় শিল্পায়ন, দূষণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অধিক জনসংখ্যার চাপ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তাই ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে আবাদযোগ্য ভূমি হ্রাস সমস্যা মোকাবিলায় বহুমুখী বীজ উৎপাদন, গবাদিপশুর জিনগত বৈচিত্র সংরক্ষণের বিকল্প নেই। ইসলাম বহুমুখী বীজ উৎপাদনসহ খাদ্যনিরাপত্তা বিধানে যেকোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণকে উৎসাহিত করে। কেননা বান্দার চেষ্টার মাধ্যমে মহান আল্লাহই বান্দার সমস্যা সমাধানের পথ তৈরি করে করেন। কুরআনের বাণী,

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ـ

"যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পথ করে দিবেন।"[৩১]

২. বহুমুখী উদ্ভিদ বীজ ও গবাদিপশু জাত দ্রব্য ব্যবহারে সকলের সুষ্ঠু ও সমান অংশীদারিত্বের পথ সুগম করা : খাদ্য মানুষের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে সকলে সুষ্ঠু ও সমান অংশীদার হওয়ার অধিকারী। ইসলাম মানুষের জীবিকা হিসেবে যে সকল উপাদান দিয়েছেন তা ভোগের ক্ষেত্রেও সকলের সুষ্ঠু ও সমান অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ـ

"তিনিতো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন, অতএব তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তার প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর।"[৩২]

লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন পদ্ধতি

এই লক্ষ্যগুলো পূরণে ৩টি বাস্তবায়ন পদ্ধতি সুপারিশ করা হয়েছে-

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৬

"২.ক. উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে কৃষি উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো, কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ সেবা, প্রযুক্তি উন্নয়ন এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিসম্পদের জিনভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে বর্ধিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতাসহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি।"[৩৩]

এ লক্ষ্যমাত্রার আলোচ্য বিষয় হলো- আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি। উন্নয়নের একটি অন্যতম দিক হলো বিনিয়োগ। বিনিয়োগের ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়, পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক প্রবাহে অগ্রগতি সাধিত হয়। আলোচ্য লক্ষ্যমাত্রায় বর্ণিত কৃষি বিনিয়োগে ইসলাম মানুষকে উৎসাহ দেয়। এজন্য ইসলাম জমি পতিত না রেখে শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে চাষাবাদ করতে উৎসাহ দেয়। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "সাধারণত তিন প্রকার মানুষ কৃষিকাজ করে থাকে। যথা– ১. যার নিজ জমি আছে, সে তা নিজে চাষ করবে, ২. যাকে চাষ করার জন্য জমি দান করা হবে, সে তা চাষাবাদ করবে ও ৩. যে লোক স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে জমি ইজারা নিয়েছে, সে তা চাষাবাদ করবে।"[৩৪]

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৭

"২.খ. দোহা উন্নয়ন রাউন্ডের ঘোষণা অনুযায়ী কৃষিপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সকল ধরনের ভর্তুকির অবসান এবং রপ্তানি-সংশ্লিষ্ট অনুরূপ সকল ব্যবস্থা রহিতকরণসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বৈশ্বিক কৃষিবাজারের বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিধিনিষেধ ও অসামঞ্জস্যের সংশোধন ও নিরসন।"[৩৫]

ইসলাম বাজার ব্যবস্থাপনায় সকল ধরনের অবৈধ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম এমন কোনো আইন সমর্থন করে না, যা কোনো এক পক্ষকে সুবিধা দেয় এবং আরেক পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সুতরাং বাজারে সকলের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, "সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহ.) হতে বর্ণিত, উমর ইবন খাত্তাব (রা.) (একবার বাজারে) হাতিব ইবন আবি বালতা (রা.)-এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। তিনি [হাতিব (রা.)] বাজারে তার কিচমিচ বিক্রয় করছিলেন। [বাজারদর হতে সস্তা মূল্যে- মুনাক্কা]। উমর (রা.) তাকে বললেন, হয়তো মূল্য বাড়িয়ে (ন্যায্য মূল্যে) বিক্রয় করুন, নচেৎ আমাদের বাজার হতে পণ্য গুটিয়ে নিন।"[৩৬]

বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা-৮

"২.গ. খাদ্যপণ্য মূল্যের চরম অস্থিরতাকে নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে খাদ্য মজুদ বিষয়ক তথ্যসহ সঠিক সময়ে বাজার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ এবং খাদ্যপণ্যের বাজার ও সংশ্লিষ্ট ব্যুৎপন্নসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।"[৩৭]

খাদ্য মজুদ ইসলামে হারাম। সুতরাং এ বিধান বাস্তবায়নে আমাদেরকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সত্যিকার অর্থে বাঁচতে চাইলে উদ্যোগ নিতে হবে নিজেদেরই। আমাদের শপথ নিতে হবে নিজেকে বদলানোর। মহান আল্লাহ বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ـ

"এবং আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ে অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে।"[৩৮]

সুপারিশমালা

ইসলাম খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। টেকসই খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে নিম্নরূপ সুপারিশ গ্রহণ করা যেতে পারে–

- খাদ্য উৎপাদন ত্বরান্বিত করা। বর্তমান বিশ্বে প্রতিনিয়ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি না হলে, খাদ্য সংকট দেখা দিবে। তাই খাদ্যনিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে খাদ্য উৎপাদন ত্বরান্বিত করা জরুরি।
- কৃষি জমি পতিত না রাখা। এ লক্ষ্যে ভূমির উপযোগিতার ভিত্তিতে ফসল উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। একই সাথে কৃষি জমিতে শিল্প কারখানা স্থাপন ও বসতবাড়ি নির্মাণের হার কমানো। ফলে কৃষি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
- খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা। খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সাথে এর বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় শৃংখলা বিধানের মাধ্যমে খাদ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হবে। খাদ্যমূল্য স্থিতিশীল না হলে খাদ্যনিরাপত্তা অসম্ভব।
- প্রান্তিক কৃষককে কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও আর্থিক সহায়তা দান। কৃষির আধুনিকায়নের সুফল ভোগ করতে হলে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। তাই আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ব্যবহারে প্রান্তিক কৃষকসহ সকল শ্রেণির কৃষককে যথাযথ প্রশিক্ষণ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাধীন খাদ্য সংরক্ষণ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ খাদ্যনিরাপত্তা বিধানে বড় বাধা। তাই দুর্যোগকালীন বিপদগ্রস্ত মানুষের খাদ্যনিরাপত্তায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- প্রতিবন্ধি, শিশু, বৃদ্ধসহ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর খাদ্যনিরাপত্তা বিধান করা।
- খাদ্য সংশ্লিষ্ট অপরাধ দূরীকরণে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ।
- খাদ্যনিরাপত্তা বিধানে প্রচলিত আইনের সংস্কার, যথাযথ আইন প্রণয়ন এবং আইনের কঠোর বাস্তবায়ন করা।
- খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বণ্টনে ইসলামি নির্দেশনা অনুসরণ করা।
- খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ, মজুতদারী, মুনাফাখোরী ইত্যাদি অপরাধ দমনে ইসলামি নির্দেশনা তুলে ধরে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কলাম লিখন, গ্রন্থ রচনা, অডিও ও ভিডিও নির্ভর অনুষ্ঠানমালা মিডিয়ায় প্রচার করা যেতে পারে।

উপসংহার

খাদ্যনিরাপত্তার সাথে টেকসই উন্নয়নের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলেও আমাদের দেশে খাদ্যনিরাপত্তা মোকাবিলায় নানাবিধ আইন প্রণীত হয়েছে, যেমন– নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩, ভোক্তা অধিকার আইন-২০০৯, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ (সভা ও কার্যক্রম) বিধিমালা-২০১০, মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯, বি, এস, টি, আইন অধ্যাদেশ-১৯৮৫, বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ–২০০৫ এবং দণ্ডবিধি- ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬ ইত্যাদি আইন। এ সকল আইনের পাশাপাশি সরকারি খাদ্য উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন করেও খাদ্যনিরাপত্তা বিধানের শতভাগ কার্যকারিতা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শুধু আইন দিয়ে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়; বরং আইনের পাশাপাশি ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খাদ্য সমস্যা সমাধান করে খাদ্যনিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব হবে। একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে খাদ্যনিরাপত্তার সম্পর্ক রয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অধীন খাদ্যনিরাপত্তা একটি অন্যতম দিক। ইসলামি দৃষ্টিকোণে প্রতিটি মানুষের খাদ্যের অধিকার রয়েছে। মহান আল্লাহ এ পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনিই সকলের রিজিক দান করেন। সমাজের মানুষ মহান আল্লাহর কুদরতে খাদ্যশস্য উৎপাদন করে তা থেকে ভোগ করছে; কিন্তু সমাজের কিছু ঘৃণ্য স্বভাবের লোক এ খাবার মজুদ, ভেজাল মিশ্রণ, অপচয়, অপব্যয় ইত্যাদি নানা উপায়ে বিনষ্ট করছে। খাদ্যে ভেজাল, মজুতদারী, কালোবাজারী, পরিবহন সংকট, সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা, উৎপাদন হ্রাস, ভূমি ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি, ত্রুটিপূর্ণ খাদ্য-আইন ও খাদ্য-আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকা, খাদ্য আমদানি ও রপ্তানি বিধিমালার প্রয়োগে অবহেলা; সর্বোপরি দুর্নীতির কালো থাবার ন্যায় মানবসৃষ্ট কারণের পাশাপাশি প্রাকৃতিক কারণেও খাদ্যনিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন। ফলে টেকসই খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। ইসলাম খাদ্য উৎপাদন তথা জীবিকা উপার্জন ফরজ এবং অভুক্ত ব্যক্তিকে খাদ্য খাওয়ানোকে অত্যধিক সাওয়াবের কাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। পাশাপাশি খাদ্য মজুদ ও ভেজাল মিশ্রণসহ খাদ্যনিরাপত্তা সম্পর্কিত সকল অপরাধকে হারাম ঘোষণা করেছে। তাই ইসলামি সমাজের প্রতিটি মানুষ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ইসলাম প্রদর্শিত নীতি ও নির্দেশনা অনুসরণ করার মাধ্যমে টেকসই খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. Food security, at the individual, household, national, regional and global levels [is achieved] when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. [Editorial Board, *Trade Reforms And Food Security : Conceptualizing the Linkages* (Rome : Food And Agriculture Organization of The United Nations, 2003), p. 28]

২. The General Assembly, 4th plenary meeting 25 September 2015 (New York : United Nations, 2015) Seventieth session Agenda items 15 and 116, p.15

৩. আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গ্রণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩*, ২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন, ঢাকা, ১০ অক্টোবর, ২০১৩, ধারা নং - ২.১৭

৪. মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন নিশাপুরি আল কুসাইরী, *আস সহিহ* (বৈরুত : দারু এহয়া তুরাসুল আরবি, তা.বি.), হাদিস নং : ১০১/১৬৪

৫. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারি, *আস সহিহ* (মিশর : দারু তাওকুন নাজাত, ১৪২২ হি.), হাদিস নং : ১২

৬. মওলানা মুশাহিদ আলী, *ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃ. ১৩৮

৭. আবু দাউদ সূলায়মান বিন আশআস বিন ইসহাক আসসিজিস্তানি, *আস সুনান* (বৈরুত : মাকতাবা আসরীয়াহ, তা.বি.), হাদিস নং : ২৯৫৪

৮. The General Assembly, op.cit., P.15

৯. Krause, *Food Nutrition and Diet Theraphy* (USA : Saunders (W.B.) Co Ltd.), vol. 1, p. 19

১০. আল কুরআন, ১৬ : ৬৮-৬৯

১১. আল কুরআন, ১৬ : ৫

১২. আল কুরআন, ২ : ২৩৩

১৩. হাফেজ ইমাদুদ্দিন ইবন কাসির, ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান অনূদিত, *তাফসীর ইব্‌নে* কাসির (ঢাকা : তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি, ১৯৮৬), প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৬৫৩

১৪. The General Assembly, op.cit., P.15

১৫. আল কুরআন, ৫ : ৯৬

১৬. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ১৪১৩

১৭. আল কুরআন, ৭ : ১২৮

১৮. মওলানা মুশাহিদ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

১৯. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ১৬০৫

২০. আল কুরআন, ৬২ : ১০

২১. The General Assembly, op.cit., P.15

২২. ইমাম বুখারি, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ২৩৩৯

২৩. বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আ লী ইবন আবূ বাকর আল ফারগানী আল মারগীনানী, *আল হিদায়া* (দিল্লী : কুতুবখানা রহীমিয়্যা, তা.বি), খ. ৪, পৃ. ৪৬

২৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ, *আস সুনান* (মিশর : দার এহয়া কুতুবুল আরাবী, তা.বি.), হাদিস নং : ২৪৭২

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৭

২৬. কামরুল ইসলাম চৌধুরী সম্পাদিত, *বাংলাদেশ পরিবেশচিত্র ১৪০৬* (ঢাকা : বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম, এপ্রিল ২০০০), পৃ. ১৩৩

২৭. ইমাম ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ২৩৪১

২৮. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ২৫৮০/৫৮

২৯. ইমাম বুখারি, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ২৩৯

৩০. The General Assembly, op.cit., P.15

৩১. আল কুরআন, ৬৫ : ২

৩২. আল কুরআন, ৬৭ : ১৫

৩৩. The General Assembly, op.cit., P.16

৩৪. ইমাম আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং : ৩৪০০

৩৫. The General Assembly, op.cit., P.16

৩৬. মালেক বিন মালেক বিন আনাস বিন আমের মাদানী, *আল মুয়াত্তা* (বৈরুত : মুআস্সাতুর রিসালাহ, তাবি), হাদিস নং : ২৩৯৯

৩৭. The General Assembly, op.cit., P.16

৩৮. আল কুরআন, ১৩ : ১১